শেষ, সমাপ্তি ও জোড়া সমাপ্তি

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

গল্পর শেষ (এন্‌ড্‌) আর সমাপ্তি (ক্লোজার) এক ব্যাপার নয়, অন্তত কথাসাহিত্যর ক্ষেত্রে দু-এর মধ্যে একটা তফাত করতেই হয়।[১] কোনো গল্প শুরু হলেই শ্রোতা/পাঠকের প্রত্যাশা থাকে : শেষ পর্যন্ত গল্পটির পরিণতি কী হবে। পরিণতির এই অনিশ্চয়তাই গল্পর মূল আকর্ষণ।

বাচ্চাকে গল্প বলার অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরা জানেন : কোনো পরিণতিই বাচ্চার মনে ধরে না। যেখানেই থামুন, নাছোড়বান্দার মতো সে বলে চলবে, 'তারপর?' উত্তর দিলেও রেহাই নেই, আবার শুনতে হবে, 'তারপর?' এই সমস্যার জন্যেই মনে হয় সেই বিখ্যাত ছড়া তৈরি হয়েছে:

আমার গল্প ফুরল
নটে গাছটি মুড়ল
কেন রে নটে মুড়লি...

তাত্ত্বিকভাবে এই অনবস্থা বা ইনফিনাইট রিগ্রেস -এর মতো অশেষ অগ্রগতি (ইনফিনাইট প্রগ্রেস) চলতে পারে। কিন্তু গল্পর ইলাস্‌টিক এভাবে টানা যায় না। তাই এক-সময়ে-না-এক-সময়ে কাউকে পিঁপড়ের মতো গাজোয়ারি করে বলতে হয়:

বেশ করেছি, কামড়েছি।
কুটুস কুটুস কামড়াব।
গর্তের ভেতর সেঁধুর।[২]

আসলে ছোটোদের গল্প শুরু করার একটা সহজ কায়দা এককালে চালু ছিল: আরম্ভ হতো 'এক যে ছিল রাজা' ধরণের কোনো বাক্য দিয়ে। তার দেশ - কাল বলে কিছুই নেই। তেমনি কিশোরীদের জন্যে লেখা প্রেমের গল্প শেষ হতো 'তারপর তারা সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করতে লাগল' -এই দিয়ে। বাঙলা ব্রতকথার ছটকাও এইরকম। কোনো দেব বা দেবীর আরাধনা না করলে ক্ষতি, আরাধনা করলে লাভ -এই ছিল তার বিষয়। সবচেয়ে হালের দেবী, সন্তোষী মা-র ব্রতকথা ও পাঁচালিও একই ভাবে বলা ও লেখা হয়েছে।[৩] এই ধরণের শুরু ও শেষ-এর একটা সুবিধে হলো: পরিণতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকে না। এই শুরু আর শেষ-এর মধ্যে যা ঘটে তা-ই হলো আসল গল্প।

চুটকি হাসির গল্পর ক্ষেত্রে আর শেষ-এর মধ্যে বিশেষ কিছু ঘটে না। ফলে তার ছকটা মোটামুটিভাবে এই রকম:

শুরু –> শেষ

কিন্তু তার চেয়ে লম্বা গল্প - সে ছোটোগল্প, বড়গল্প, উপন্যাস, মহাকাব্য যাই হোক - তার গড়ন হয় এইরকম:

শুরু <–> মধ্য <–> শেষ

ছোটোগল্পর ক্ষেত্রে শুরু ও শেষভাগ সর্বদা খুব বেশি জায়গা নেয় না। মধ্যভাগই আসল। কিন্তু বড়গল্প/ উপন্যাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনটিই অনেক বেশি জায়গা জুড়ে থাকে।

এতক্ষণ যা বলা হলো তার কোনোটিই নতুন কথা নয়। সহজ বুদ্ধিতেই এগুলো বোঝা যায়। হালের ন্যত্রারেটলজিস্টরা এর জন্যে বিস্তর পরিভাষা তৈরি করেছেন।[৪] মশা মারতে কামান দাগা ছাড়া তাকে আর কিছু বলা যায় না। তবে শেষ আর সমাপ্তির মধ্যে তফাতটা সত্যিই দরকারি। সমাপ্তি বলতে বোঝায় কোনো গল্পর প্রত্যাশিত বা অপ্রত্যাশিত পরিণতি, যার পরে আর জানার মতো কিছু থাকে না।[৫] কিন্তু সব গল্পই কোথাও - না-কোথাও শেষ করতে হয়। তবে সেখানেই যে তার সমাপ্তি - এমন নাও হতে পারে। যেমন, পরশুরামের ''ভুশণ্ডীর মাঠে'। এক জায়গায় পৌঁছে গল্পটি শেষ হয় ঠিকই, কিন্তু মূল সমস্যার কোনো সমাধান হয় না। শিবুর তিন জন্মর তিন স্ত্রী আর নৃত্যকালীর তিন জন্মর তিন স্বামী নিজেদের মধ্যে চুলোচুলিতে জড়িয়ে পড়েন। সেই সুযোগে দুনিয়ার সব রকমের দেশী - বিদেশী ভূত - প্রেত মজা লুটতে জোটে। সমস্যা এত জটিল যে তার জট কী করে খোলা যায় তা সর্বজ্ঞ লেখকও জানেন না।

এ ধরনের গল্পকে বলে ওপেন-এন্‌ডেড, অর্থাৎ শেষ হয়েও শেষ হলো না, শেষটা খোলা রইল। কিন্তু সত্যিই কি গল্পটি ওপেন -এন্‌ডেড? সেটি এক জায়গায় এসে থামে, কিন্তু পাঠকের কৌতূহল তাতে মেটে না। অন্য কথা বললে, গল্পটি শেষ হয় কিন্তু সমাপ্ত হয় না।

এই সমাপ্তির দিকটি পরশুরাম নিজেই খুঁচিয়ে তোলেন। গল্পটির শেষ অনুচ্ছেদ শুরু হয় এইভাবে:

> তারপর যে ব্যাপার আরম্ভ হইল তাহা মনে করিলেও কলমের কালি শুখাইয়া যায়। শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী - এই ডবল ত্র্যহস্পর্শযোগে ভুষণ্ডীর মাঠে যুগপৎ জলস্তম্ভ, দাবানল ও ভূমিকম্প শুরু হইল। ভূত, প্রেত, দৈত্য, পিশাচ, তাল, বেতাল প্রভৃতি দেশী উপদেবতা যেখানে ছিল, তামাশা দেখিতে আসিল। স্পূক, পিক্সি, নোম, গব্‌লিন প্রভৃতি গোঁফ - কামানো বিলাতি ভূত বাঁশি বাজাইয়া নাচিতে লাগিল। জিন, জান, আফ্রিদ, মারীদ্‌ প্রভৃতি লম্বা - দাড়িওয়ালা কাবুলী ভূত দাপাদাপি আরম্ভ করিল। চিং চ্যাং, ফ্যাচাং ইত্যাদি মাকুন্দে চীনে-ভূত ডিগবাজি খাইতে লাগিল।

শুধু ''ভুশণ্ডীর মাঠে' নয়, ''প্রেমচক্র'' গল্পটিও একই ধাঁচের। তবে প্রথমটি ছিল টানা একটা গল্প, দ্বিতীয়টি একের - ভেতরে - দুই গল্পর ছকে পড়ে, অর্থাৎ একটি কাঠামো -গল্পটির বিষয়-দাম্পত্য সম্পর্ক - গৌণ হলেও তুচ্ছ নয়। মূল কাহিনীর শেষে সেটি আবার ফিরে আসে। তার কারণও আছে। মূল গল্পটির কোনো সমাপ্তি নেই। ছোকরা ভাগনের ফরমাশে সত্যযুগ নিয়ে মামা যে - গল্প ফেঁদেছিলেন, স্ত্রীর ধমকে তিনি তাঁর পরিকল্পিত পরিণতিটা ভুলে যান - লেখা তো দূরের কথা, মুখেও সেটি বলতে পারেন না। ফলে মূল কাহিনীটি এক জায়গায় শেষ হলেও তার সমাপ্তি হয় না: পাঠকের কৌতূহল থেকেই যায়।

এই ধরণের কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে অন্যান্য গল্পর ক্ষেত্রে পরশুরাম কিন্তু শেষ দাঁড়ি টানার আগে একটা সমাপ্তিও দেখান। একটানা গল্প ও একের - ভেতর - দুই গল্প - দু-এর ক্ষেত্রেই কথাটা খাটে। তবে কয়েকটি গল্প পরশুরাম যা করেন তাকে জাড়া সমাপ্তি বা ডবল ক্লোজার বলা যেতে পারে। তার মানে গল্পটি যেখানে প্রায় শেষ হলো, সেখানেই স্বাভাবিক সমাপ্তি হয়েছে। কিন্তু তারপরেও পরশুরামের মনে হয়: চরিত্রদের হালচাল নিয়ে আরও কিছু খবর দেওয়া দরকার। লেখক - জীবনের সব পর্বে তিনি এমন জোড়া সমাপ্তির গল্প লিখেছেন।

যেমন ''বিরিঞ্চিবাবা''। শিব সেজে লোক - ঠকানোর চেষ্টা করে ছোটো মহারাজ ধরা পড়ে যান। বিবিঞ্চিবাবা তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখেন, কিন্তু কোনো লাভ হয় না। তাঁর প্রাক্তন লোভী আর বোকা ভক্তরাই তাঁকে মারধর দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

গল্পটি এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু এর সঙ্গে পরশুরাম একটা রোমান্‌স্‌ এর ব্যাপার জুড়ে দেন। গল্পর মাঝামাঝি তার সূত্রপাত হয়েছিল। বুঁচকীকে সত্য প্রথমে 'আপনি' বলত, হোমঘরে সে হঠাৎ 'তুমি' বলতে শুরু করল। আর হোমঘরে বুঁচকী হয়ে যায় 'বুঁচু'।[৬] গল্পর দ্বিতীয় সমাপ্তিতে নিবারণকে তাই সত্য বলেই ফেলে, ''আমি বুঁচকীকে

বে করব।" গল্পটি শেষ হয় নাটকের ঢঙে, নিবারণ আর সত্যর সংলাপে:

আহারান্তে সত্য বলিল -'ওঃ, কি মুশকিলেই পড়া গেছে।'
নিবারণ বলিল - 'আবার কি হ'ল -রে?'
সত্য। নিবারণ - দা।
নিবারণ। ব'লেই ফ্যাল না কি।
নিবারণ। তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু তোর সঙ্গে বিয়ে যদি না দেয়?
সত্য। আলবত দেবে, বুঁচকীর বাপ দেবে।
নিবারণ। বাপ না হয় রাজী হ'ল। কিন্তু মেয়ে কি বলে?
সত্য। বড় গোলমেলে জবাব দিচ্ছে।
নিবারণ। কি বললে বুঁচকী?
সত্য। বললে - যাঃ।
নিবারণ। দূর গাধা, যাঃ মানেই হ্যাঁঃ।

জোড়া সমাপ্তির ক্ষেত্রে শেষ উদাহরণ পরশুরামেই ''সরলাক্ষ হোম'। বরুণ - মাণ্ডবী খঞ্জনা ত্রিভুজের একটা ফয়সালা হয়; মাণ্ডবীকে বিয়ে করে শ্রীগদাধরের জামাই হন সরলাক্ষ। ঠিক হয় : পরিকল্পন - মহোপদেষ্টা, অর্থাৎ অ্যাডভাইসার - জেনারেল অভ স্কীম্‌স নামে একটি পদ তাঁর জন্যেই তৈরি করা হবে, মাসিক মাইনে মাত্র সাড়ে তিন হাজার টাকা (১৯৫৩ সালে নেহাত কম টাকা নয়!)।

লোকের কৌতূহল এতেও না মিটতে পারে। পাঠকের মনের কথা বুঝে সরাসরি তাদের উদ্দেশে পরশুরাম জানান :
কিন্তু বরুণ বিশ্বাসের কি হল? তার কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। তাকে বিয়ে করবার জন্যে একটি মাদ্রাজী, দুটো পাঞ্জাবী আর তিনটে ফিরিঙ্গী মেয়ে ছেঁকে ধরেছে, তা ছাড়া ওখানকার (দহরমগঞ্জের) জজ- গিন্নি, ডেপুটি -গিন্নী আর উকিল - গিন্নীও নিজের নিজের আইবুড় মেয়েদের বরুণের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছেন। বেচারা কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

যে দুটি গল্প নিয়ে আলোচনা করা হল যে দুটিই প্রথম পুরুষ অর্থাৎ 'সে'/ 'তিনি' -র আঙ্গিকে লেখা। কাঠামো - গল্পর ভেতরে 'আমি'-র আঙ্গিকে যে -গল্প বলা হয়, সেখানেও পরশুরাম জোড়া সমাপ্তির নমুনা দিয়েছেন। ''স্বয়ম্বরা'' -য় জোন জিল্‌টার -এর সঙ্গে বিল বাউন্ডার -এর বিয়েতেই গল্পটা শেষ হতে পারত। কিন্তু বিনোদ উকিল প্রায় জেরা করে চলেন, চানুজ্যে মশায়কে তার উত্তর দিতে হয়। পাঠক জানতে পারেন : সে বিয়ে টেকে নি, 'বিয়ের পরদিনই বেটী পালিয়েছে। সায়েব তাকে খুঁজতে গেছে।'

একই ব্যাপার ঘটে ''মহেশের মহাযাত্রা''-য়। 'ও হরিনাথ - আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি -' বলতে বলতে মহেশ মিত্তির কোথায় হারিয়ে গেলেন। হরিনাথ মূর্ছা গিয়েছিলেন, যদিও পুলিশ তাঁকে মাতাল ভেবে ধরে নিয়ে যায়। ফলে তাঁর পক্ষে আর কিছু জানা সম্ভব হয়নি। এখানেই গল্পর চমৎকার শেষ হতে পারত। কিন্তু বংশলোচনবাবুর আড্ডার লোকজন এমন সমাপ্তিতে খুশি হন না। তাঁরা আরও শুনতে চান। তারই সূত্রে আমরা জানাতে পারি : শুধু গয়া নয় পিণ্ডিদাদনখাঁ-য় পর্যন্ত মহেশবাবুর জন্য পিণ্ডি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনো ফল হয় নি, পিডি ছিটকে ফিরে আসে। বংশলোচনবাবু অবাক হয়ে জানতে চান, ''তার মানে?'' চাটুজ্যেমশায় বুঝিয়ে বলেন, ''মানে - মহেশ পিণ্ডি নিলেন না, কিংবা তাকে নিতে দিলে না।'' বংশলোচনবাবু ভোলেন নি যে মহেশ মিত্তির তাঁর পৈতৃক দশ হাজার টাকার কম্পানির কাগজ কলকাতা ইউনিভারসিটিকে দান করেছিলেন; যে - ছাত্র ভূতের অনস্তিত্ব সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখবে তাকে ঐ টাকার সুদ থেকে প্রতি বছর একটি পুরুস্কার দেওয়া হবে। বংশলোচনবাবু তাই জিগেস করেন, ''মহেশ মিত্তিরের টাকাটা?'' সর্বজ্ঞ চাটুজ্যেমশায় সে-খবরও রাখেন। তিনি বলেন, ''সেটা ইউনিভার্সিটিতে গচ্ছিত আছে, কিন্তু কাজ কিছুই হয় নি, ভূতের বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখতে কোন ছাত্রের সাহস নেই। এখন সেই টাকা সুদে - আসলে প্রায় পঁচিশ হাজার হয়েছে। একবার সেনেটে প্রস্তাব ওঠে টাকাটা প্রত্নবিভাগের জন্য খরচ হ'ক। কিন্তু ছাদের ওপর এমন দুপদাপ শব্দ শুরু হ'ল যে সব্বাই ভয়ে পালালেন। সেই থেকে মহেশফাণ্ডের না কেউ করে না।"

ভেতরের গল্পর কথকও যে সর্বজ্ঞ হতে পারেন তার নমুনা এইখানেই পাওয়া যায়। ''স্বয়ম্বরা'' ছিল চাটুজ্যেমশায়ের নিজের অভিজ্ঞতার বিবরণ। মহেশ মিত্তিরের গল্পটি তাঁর শোনা কথা। কিন্তু দুক্ষেত্রেই তিনি সর্বজ্ঞ। যা-ই প্রশ্ন করা হোক, উত্তর তাঁর জিভের ডগায়।

এরই রকমফের দেখা যায় ''যদু ডাক্তারের পেশেন্ট' গল্পে। সেখানে দেখা ও শোনা দুই ব্যাপারই মিশে থাকে।

''যদু ডাক্তারের পেশেন্ট'' গল্পটি একেবারে ঠিক জায়গায় শেষ হয়। মস্তক বিনিময়ের পুরনো কাহিনী নতুন রূপে দেখা দিয়েছে।[৭] পঞ্চীর মুণ্ডু তার প্রেমিক জটিরামের ধড়ে আর জটিরামের মুণ্ডু তার প্রেমিকা পঞ্চীর ধড়ে সেলাই করে যদু ডাক্তার বিয়েও দিয়েছেন, তাঁর আশ্রমেই তারা থাকবে।

গল্পটি শুনে ডাক্তার আশ্বিনী সেন বলে ওঠেন, 'কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!' এর পরে আর কী আশ্চর্য থাকতে পারে।[৮] ডাক্তার হরিশ চাকলাদারও বলেন, 'ফ্ল্যাবারগাস্টীং মিরাক্‌ল', তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো দৈবঘটনা। ক্যাপ্টেন বেণী দত্তও স্বীকার করেন গল্পটি 'অতি খাসা'। কিন্তু তাঁর কৌতূহল একটু বেশি। তিনি তাই জানতে চান, ''আচ্ছা সার, নায়ক - নায়িকার তো একটা হিল্লে লাগিয়ে দিলেন, কিন্তু রমাকান্তর কি হল?'' যদু ডাক্তার বলেন, ''শুনেছি এক বছর পরে সে চুপি চুপি বিঘোর বাবার আশ্রমে এসেছিল, কিন্তু জটি আর পঞ্চীকে দেখে ভূত - পেত্নী মনে করে তখনই ভয়ে পালিয়ে যায়। তারপর থেকে সে নিরুদ্দেশ।"

এতেও কিন্তু বেণী দত্তর কৌতূহল মেটে না। শেষ প্রশ্ন, ''আচ্ছা তার পর আর কখনও আপনি পঞ্চী আর জটিরামকে দেখেছিলেন?'' এর উত্তর পরশুরাম এককথায় দিতে পারতেন। কিন্তু সমাপ্তিকে তিনি আবার একটু পিছিয়ে দেন। নতুন করে একটি প্রশ্ন - উত্তর পর্ব চলে :

—দেখেছিলুম। দু বছর পরে বিঘোর বাবা চিঠি লিখলেন, মাঘ সংক্রান্তির দিন জটি - পঞ্চীর ছেলের অন্নপ্রাশন, তুমি অবশ্যই আসবে। বাবার যখন আদেশ তখন যেতেই হল।
—ক দেখলেন গিয়ে?
দেখলুম, বিঘোর বাবা ঠিক আগের মতন লাল চেলির জোড় পড়ে দাঁড়িয়ে হুকো টানছেন, পঞ্জী তার মস্কিউলার মদ্দা হাতে একটা মস্ত কুড়ুল নিয়ে কাঠ চেলা করছে, জটিরাম রোয়াকে বাসে একটি পিঁড়িতে আলপনা দিচ্ছে আর কোলের ছেলেকে মাই খাওয়াচ্ছে।

এখানেও ন্যারেটীদের ভূমিকা খেয়াল করার মতো, যদিও ন্যারেটলজিস্টরা তাঁদের নেহাতই ফালতু বলে ধরে নেন।[৯] তত্ত্বকারদের ভাবটা এইরকম : ন্যারেটর থাকলে একজন ন্যারেটী তো থাকতেই হবে, কিন্তু সে নেহাতই টেক্‌সচুয়াল কন্‌স্ট্রাক্‌ট্।[১০] কথাটা যে আদৌ সত্যি নয় তা পরশুরামের গল্প পড়লে বোঝা যায়। ন্যারেটিরা না থাকলে গল্পগুলো তেমন উতরোত না। তারাই গল্পর মধ্যে বাধা দিয়ে, আপত্তি তুলে সঙ্গত বা বেয়াড়া প্রশ্ন করে গল্পকে জমিয়ে তোলে। আর ভেতরের গল্প শেষ হলেও তাদের কৌতূহল মেটাতেই আনতে হয় গল্পর দ্বিতীয় সমাপ্তি। ন্যারেটীদের বাদ দিয়ে ন্যারেশন ও ন্যারেটিভ - এর আলোচনা খুবই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

গল্পর শেষে অপ্রত্যাশিত সমাপ্তিকে বলা হয় টুইস্ট ইন দ টেল বা ন্যাজে মোচড়, অথবা ও. হেনরি-র গল্পে যেমন থাকে হুইপ ক্র্যাক এন্‌ডিং, চাবুক - হাঁকড়ানো পরিণতি। এই কৌশলটি জোড়া সমাপ্তির সঙ্গে মিশেও থাকতে পারে। গল্পর শ্রোতা/পাঠকের কৌতূহলকে লেখক এখানে মর্যাদা দেন। ন্যায্যত যে-প্রশ্ন উঠতে পারে সেটির উত্তর দেওয়াও তাঁর দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। এতে গল্পর মজাও দু-গুণ বাড়ে।
তবে সব জোড়া সমাপ্তির গল্পে অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে না (যেমন ঘটে ন্যাজ-মোচড়ানো গল্পে), বরং প্রত্যাশিত সমাপ্তি দিয়েই গল্পটি নিটোলভাবে শেষ হয়।

টীকা ঃ-

১. ক্লোজার-এর কথা ন্যারেটলজি-র সব অভিধানে ও আলোচনায় আসে না (যেমন, প্রিন্স্ (১৯৮৭/৮৯)-এ নেই)। এ নিয়ে অনেক দার্শনিক তত্ত্বকথাও আছে। তবে সংক্ষেপে জানতে চাইলে মারফিন ও রায়ের বইটি দেখা যেতে পারে। বিস্তৃত রচনাপঞ্জির জন্য মানফ্রেড ইআহ্ন (২০০৫) দ্র.।

২. সুকুমার রায়ের ''লক্ষ্মণের শক্তিশেল'' -এর শেষে ব্যাপারটি আরও সংক্ষেপে সারা হয়। বানর সেনারা এই বলতে বলতে বিদায় নেয়:

প্রথম। আমার কথাটি ফুরোলো
দ্বিতীয়। নটে গাছটি মুড়োলো
তৃতীয়। ক্যান রে নটে মুড়োলি
চতুর্থ। বেশ করেছি - তোর তাতে কিরে ব্যাটা.।
সকলে। ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

৩. সন্তোষী মা নিয়ে বাঙলা ও হিন্দী ব্রতকথায় অবশ্য একটু ফারাক আছে। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (২০০৩), ২৭২-৭৭ দ্র.।

৪. মানফ্রেড ইআহ্ন দ্র.।

৫. এই বিষয়টি প্রথম স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন আরিস্তোতল। ট্রাজেডি-র কাজ হলো এক ঘটনাপরম্পরাকে হাজির করা, আর সেই ঘটনাপরম্পরা (প্রাক্সিস) হবে পরিপূর্ণ ও সমগ্র। ''সমগ্র হল সেই ব্যাপার/জিনিশ যারর আদি আছে, মধ্য আছে, আর আছে শেষ। যা কোন কিছুর পরবর্তী নয়, স্বাভাবিক ভাবেই যার পরে কিছু আছে তা হল আদি। আবার যা অনিবার্যভাবে কোন কিছু পরবর্তী, কিন্তু তারপরে আর কিছু নেই, তা' হল শেষ। আর মধ্য হল যা কিছুর পরবর্তী এবং তারপরে কিছু আছে।'' কাব্যতত্ত্ব ৭। ৩ (শিশিরকুমার দাশের তর্জমা)।

৬. এর মধ্যেও একটা ব্যাপার আছে। সত্যব্রত বুঁচকীকে বলে, ''দেখুন, একটু চা খাওয়াতে পারেন?'' বুঁচকীও সত্যাকে 'আপনি' বলেই উত্তর দেয়। সত্য মনে মনে বলে, ''তোমার বাবা তো বেহুঁশ ছিলেন।'' তবে প্রকাশ্যে সে-ও 'আপনিই'-ই চালিয়ে যায়।

৭. মূল গল্পটি আছে বেতালপঞ্চবিংশতি (ষষ্ঠ উপাখ্যান)-এ। বিদ্যাসাগর, ৩: ৪৩-৪৭ দ্র.। এই গল্পটি নিয়ে টমাস মান একটি বড় কাহিনী লিখেছিলেন (১৯৪০)। টমাস মান-এর কাহিনীটি পড়ে কন্নড় নাট্যকার, গিরিশ কারনাড ১৯৭৫-এ একটি নাটক লেখেন (হয়বদন)।

৮. এই উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে একটি শ্লোক থেকে। মহাভারত -এর প্রচলিত সংস্করণে, যক্ষর 'আশ্চর্য কী' এই প্রশ্ন উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেন:

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষা স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।।
-প্রাণিগণ প্রত্যহ যমালয়ে যাচ্ছে, তথাপি অবশিষ্ট সকলে চিরজীবী হ'তে চায়, এর চেয়ে আশ্চর্য কি আছে।
(রাজশেখর বসুর তর্জমা)

মহাভারত-এর প্রামাণিক সংস্করণে (আরণ্যকপর্ব, অধ্যায় ২৯৭) শ্লোকটি নেই, প্রচলিত সংস্করণে আছে (বঙ্গবাসী সং. ৩১৩। ১৬১)। কিছু পাঠভেদও রয়েছে।

৯. প্রিন্স্ (১৯৮২), ১৬, ২৪ দ্র.। সেখানেও শুধু ন্যারেটী-র সংখ্যা, ন্যারেটরকে তিনি চেনেন কিনা - এই ধরণের স্বতঃস্পষ্ট বিষয় নিয়ে অল্প কিছু কথা আছে। অন্যত্র তিনি অবশ্য ন্যারেটীদের বহু বৈচিত্র্য - শান্ত বা বিদ্রোহী, প্রশংসার যোগ্য বা উদ্ভট ইত্যাদি - স্বীকার করেছেন; ন্যারেটর ছাড়াও ন্যারেটীদের বিচার করে গল্পর প্রকরণগত সাফল্য আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে - এমন কথাও বলেছেন। রাদু সার্দুলেস্চু ২৪-২৬ দ্র.।

১০. প্রিন্স্ (১৯৮৭/৮৯), ''ন্যারেটী'' দ্র.।

রচনাপঞ্জি ঃ-

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ। খণ্ড ৩, সাহিত্য ও বিবিধ। বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, ১৯৭২।
পরশুরাম। পরশুরাম গ্রন্থাবলী, খণ্ড ১,৩। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৩৭৬।
মহাভারত। প্রামাণিক সংস্করণ। পুণা : ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যত্রা সংশোধন মন্দির, ১৯৩৩ - ৬৬।
ঐ। প্রচলিত সংস্করণ। বঙ্গবাসী, ১৮২৬ শক।
ঐ। রাজশেখর বসু - কৃত সারানুবাদ। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স ১৩৭০।
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। কামারের এক ঘা। পাভলভ ইনস্টিটিউট, ২০০৩।
শিশিরকুমার দাশ। কাব্যতত্ত্ব : অ্যারিস্টটল। আশা প্রকাশনী, ১৯৭৭।
Jahn, Mannfred. "Narratology : A Guide to the Theory of Narrative," <http : // www.uni-koeln.de/ ~ame02>
Murfin, Ross and Supriya M. Ray. The Bedford Glossary of Critical and Literary Terms. Boston and New york: Bedford/St. Martin's, 2003.
Prince, Gerald. Narratology : The Form and Functioning of Narrative. Berlin : Mouton, 1982.
Prince, Gerald. Dictonary of Narratology. Lincoln: University of Nebraska priss, 1987.
Sardulescu; Radu. "Form, Structure and and Structurality in Critical Theory", <www.unibuc.ro>.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : কৌশিক মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যুৎ দত্ত, সিদ্ধার্থ দত্ত